বাগানবাড়ি

সুরঞ্জন প্রামাণিক

বাড়ির নাম শান্তিনীড়। নাম রেখেছিলেন সনাতন। মাণিকের ইচ্ছে ছিল, মা-বাবার নামেই বাড়িটার নাম রাখবে— সুধা -সনাতন। কিন্তু বাবার আপত্তি ছিল।

সনাতনের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। মাণিক ভাইদের মধ্যে ছোট, তার উপরে এক দিদি, ছোটবোনের সে ছোটদা। বড়দা ইমকাম ট্যাক্সের অফিসার। মেজদা স্কুল মাস্টার। দু'জনই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়েছে। বড়দা ফ্ল্যাটবাড়িতে। মেজদা এখান থেকে সাত -আট কিলোমিটার দূরে স্কুলের কাছাকাছি বাড়ি করেছে। সনাতন বারকয়েক বড় ছেলের ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থেকেছে, ভালো লাগেনি। কেমন এক দমবন্ধ অবস্থা। সূর্যের আলোর অভাব। সবসময় ইলেক্ট্রিক আলো জ্বেলে রাখতে হয়। কাক ছাড়া কোনো পাখি নেই। সবচেয়ে বড় অভাব — কথা বলার মানুষ নেই। তাছাড়া, বড় খোকা কিরকম ধূর্ত হয়ে উঠেছে, কেবল অভাবের কথা শোনায়, দেনার কথা বলে। ঠারে ঠোরে সম্পত্তির ভাগ চায়। ভাগটা পেলে বিক্রি করে দিতে পারবে, লোনটা শোধ হবে তাতে। বড়খোকার বাড়িতে গেলে, নানান শলাপরামর্শ, নানান কথায় তাঁকে গলাতে চায়। এক-এক সময় মনটা সত্যিই কেমন নরম হয়ে ওঠে, যার যা প্রাপ্য দিয়ে দেওয়াই তো উচিত— কিন্তু বাড়ি ফিরে মাণিককে দেখে, ছেলেটার লেখাপড়ার প্রতি তেমন মনোযোগ ছিল না, থাকলে হয়তো সেও আজ চাকরি - বাকরি করতে পারত, হয়তো টাকা দিয়েই একটা চাকরি কিনে দিতেন সনাতান, যেমন দিয়েছেন মেজ ছেলেকে— সেই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা 'ডোনেশন' দিয়ে স্কুলের মাস্টার হয়েছে মেজ খোকা। তা যখন হয়নি, মাণিককেও তো দেখতে হবে, চাষের জমিতে হাত দেওয়া যাবে না, তোরা যখন কলেজে পড়ছিস, বাবুগিরি মেরে বেড়াচ্ছিস, ওই মাণিক তখন আমার পাশে পাশে থেকেছে, কোন ক্ষেত্রে জল, কোথায় সার— কোন খণ্ডে তেল ছড়াতে হবে, তাকে একবারের বেশি দুবার বলতে হয়নি। মাণিকের ঘামে ভেজা খালি গা দেখে সনাতন যেন নিজেকেই দেখতে পান, ফসল ফলানোর কষ্ট আর সুখ একই সঙ্গে অনুভব করতে পারেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, না, মাঠের জমির ভাগ কেউ পাবে না। সেই সিদ্ধান্তে যে খুব তাড়াতাড়ি জানাতে হবে, সেটা ভাবেননি। সেবার মেজছেলের মেয়ের জন্মদিনে অতিথিঃঅভ্যাগতরা চলে যাবার পর কথায় - কথায় মেজ খোকা একসময় তার অভাবের কথা তুলল, একেবারে বড় খোকার মতো—জমির ভাগ পাওয়ার উচ্ছেও প্রকাশ হয়ে পড়ল তাতে। তখন সনাতন গম্ভীরভাবে বললেন, 'মাণিক তোমাদের ভাই, সে তো চাষাই থেকে লে, জমি ছাড়া সে বাঁচবে কি-ভাবে, ভেবেছ তোমরা? ভাবোনি— তোমাদের থেকে কত কম রোজগার তার— তার উপর খরা-বন্যা আছে! না, চাষের জমির ভাগ তোমরা কেউ পাবে না।' তখন মেজ বৌমা বলেছিল, 'কিন্তু আইনত—' সনাতন হাত তুলে বৌমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আইন দেখিও না। আর আইন কেন হয় জানো?' সনাতনের সমস্ত শরীর কাঁপছিল, তাঁর রাগত কণ্ঠস্বরে সবাই কেমন বাক্‌রুদ্ধ, তিনিও নিজেকে সামলে নিয়ে আর কিছু বলেন নি। কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশে খোলামেলা মেজখোকার বাড়িতেও সেই প্রথম বুকে একটা চাপ বোধ হচ্ছিল, এ বাড়িতে ফিরে না - আসা পর্যন্ত চাপটা ছিল, বাড়ি ফিরে সেই সন্ধাবেলায়, তখন বৈশাখ মাস, উঠোনে মাদুর পেতে বসে, কখন যেন টের পেয়েছিলেন, বুকটা হালকা হয়ে গেছে। অনেক ঝঞ্ঝাট পোহানোর পর যেন একটা শান্তি— তখন ছোট বৌমা শঙ্খ বাজাচ্ছিল...

তখড় অবশ্য এই বাড়িটা হয়নি। বাড়িটা হবার পর, যখন ওই নামকরণের কথা উঠল, মাণিকের ইচ্ছের বিরোধিতা করে যখন সনাতন নাম খুঁজছিলেন, তখন হয়তো ওইসব কথা তাঁর মনে পড়েছিল...বাড়ির নাম শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা—

সেই যে কবিতায় পড়েছিল ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়— তেমনই যেন কিংবা তারও বেশি, বেশি পলেই শান্তি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল, প্রথম দিকে টের পাওয়া যায়নি। একদিন আচমকা মাণিক - কৃষ্ণা দু'জনেই টের পেল খুব প্রকটভাবে।

সেদিন—ধানকলের চাতালে বসে মাণিক কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, দুবস্তা ধান ষাট কেজি কীভাবে হয়! প্রায় বাইশ কেজি ক্ষুদ— এটা কীভাবে হতে পারে! সেদ্ধ - শুকনোর গাফিলতি হয়েছে কোথাও। ধান সেদ্ধ-শুকনো করার দায়িত্ব কৃষ্ণার, তারপর শুকনো ধান কলঘরে নিয়ে যাওয়া, ভাঙানো, চালবিক্রির ব্যবস্থা—এসব মাণিকের করতে হয়। —ক্ষুদ-কুড়ো বিক্রি করেও আসল টাকা ঘরে ফেরানো যাবে না। এভাবে লখ খাওয়া! মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছিল। কিছুদিন যাবৎ —মাণিক যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, চালের পরিমাণ বস্তাপ্রতি আটত্রিশ-চল্লিশের বেশি যাচ্ছে না। তাতে অবশ্য লাভ কম হচ্ছিল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা খারাপের মতো কিছু হয়নি। কিন্তু সেদিন, বাড়ি ফিরে মাণিক কোনো ভূমিকা না করেই কৃষ্ণাকে বলল, 'শোনো বুলটির মা, দশটা কাজ একসঙ্গে করবে না।' কৃষ্ণা হেসে ফেলল।

—হাসার কী হল?

—তোমার বউ-যে লক্ষী—একথা শুনেছি কতবার, তোমার মুখে, মা-বাবার মুখে কিন্তু এখন যে তাকে দুর্গারূপে দেখচ—এই তো মাত্র দু'খানা হাত—হাসব না!

—না তুমি হাসবে না!

কৃষ্ণা মাণিকের মুখের দিকে তাকাল। এমন অসুন্দর মুখ সে আগে দেখেনি। ভয়ংকর। কৃষ্ণার মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল, কোথাও একটা দোষ হয়েছে। কিন্তু কী সেটা। কৃষ্ণা ভয়ে - ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী দোষ করেছি, বল তো!

—ধান শুকানোর সময় মন থাকে কোথায়?

কৃষ্ণা একটু সাহস ফিরে পেল, মন আর থাকবে কোথায়, হয় ভাতের হাঁড়িতে না - হয় গোয়ালে, আ-অ-র — না আর কোথাও না— মাণিক কিছু বলল না। কৃষ্ণা বলল, কী হয়েচে, বলবে তো!

—ষাট কেজি চাল বেরিয়েচে

তখন উঠোনে নাড়া ধানের দিকে তাকাল কৃষ্ণা। এক খণ্ড ছায়া ধানের ওপর, ছড়িয়ে পড়ছে—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকলে ছড়িয়ে পড়াটা স্বষ্ট বোঝা যায়। সে বলল, বলতে ভুলে গেচি— ছায়ার সঙ্গে পেরে উঠছি না—ওই দেখ!

মাণিক দেখল বটে কিন্তু খিঁচিয়ে উঠল, দেখানোর কী আচে, ধানগুলো রোদের দিকে সরাবে তো— এটাই তোমার দোষ, কোথাও এমন মশগুল হয়ে যাও, তার ওপর রেডিও তো আছেই—কৃষ্ণা আবারও মাণিককে দেখল, কেমন যেন —অচেনা কেউ। তারপর থেকে শান্তিনীড়ে রেডিও বাজেনি।

অথচ নিত্যকর্ম ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে, ধান বাঙ্গানো, সিদ্ধ করা, শুকানো— সবই নিয়মমাফিক; কেবল কৃষ্ণার মুখটাতে মন খারাপের মিশ্র রঙ, রুকু শুকু মাঠের ফসলের মতো— তাকে দেখলে এরকমই মনে হয়েছে মানিকের।

কথা যে বন্ধ তাও নয়— দু'একটা কেজে কথা দু'জনকেই বলতে হয়েছে। দিন তিনেকের মাথায় যেটা ঘটল, উঠোনের হিমসাগর গাছটা কেটে ফেলল মাণিক।

কৃষ্ণা বাধা দেয়নি। কেবল নতুন প্রতিবেসী আকাশ মুখার্জী বলেছিল, এমন ফলবতী গাছটা কাটছেন কেন?

—উপায় নেই। (কুড়ুল চালাল।) রাদ চাই। রোদ।

তার অবাক দাঁড়িয়ে থাকা দেখে মাণিক কুড়ুল চালানো থামিয়ে বলল, বুঝলেন না তো?

আকাশ মুখার্জীর মাথাটা যেন একটু নড়ল। তাকে ক্যাবলার মতো দেখাচ্ছে। স্কুলের মাস্টার! মাণিকের হাসি পেল। বলল, ধান - চালের কাজ করি তো, মানে কুটিয়ালী—এমন রোদ দরকার যাতে একটুও ছায়া থাকবে না, শুকোনোর সময় একটু যদি টেম্বারে হেরফের হয়ে যায় তাহলে ক্ষুদের পরিমাণ বেড়ে যাবে —তাই।

কিন্তু গাছ গাটবার পরও উঠোন ছায়ামুক্ত হল না। আমগাছের ছায়া তো ছিলই, সেই ছায়ার ওপর যে অন্য গাছেদের ছায়া এসে পড়েছিল, সেটা বুঝতে পারেনি মাণিক। কিন্তু সে য়ায়া সরানোর উপায় নেই। গাছগুলো তাদের নয়।

গভীর অনুশোচনা, রাগ ক্ষোভ, জীবিকার অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে মাণিক কেমন অস্থির। সে অস্থির হলে, ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় স্থির বসে থাকে। কাজের কথা মনে করিয়ে দিলে তখনই সে কাজে ছোটে। মাণিক বসেছিল। এ যেন তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত। কিন্তু কে বা কারা এই চক্রান্ত করেছে— নির্দিষ্টভাবে কাউকে সে খুঁজে পায় না। কেবল মনে হয়, এই জমিগুলো যদি বিক্রি না হত! তখনই মনে পড়ে মেজ বৌদির সেই কথা, এই বাড়িতে বসেই বিষয় - সম্পত্তি নিয়ে প্রায় উকিলের ঢঙে কথা বলেছিল, এ বাড়ির মেজ বৌ, বাবা, আমি আইনের কতা তুলছি না— লোনে - লোনে জেরবার আপনার ছেলে, টিউশনি করে যে দুপয়সা বাড়তি রোজগার করবে— সে উপায়ও নেই, মাণিক ঠাকুরপোর কথা আপনি নিশ্চয়ই ভাববেন, ঠিকই তো মাঠের জমি ভাগ হলে, ঠাকুরপোর খুবই অসুবিধে হবে— কিন্তু বাড়ির জমির ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই হবে না— কথার পর কথা উঠেছে।...সেই কথোপকথনের শেষ কথাটি ছিল বৌদির, আপনি কিন্তু কাউকে বঞ্চিত করতে পারেন না—

তারপর কাউকে বঞ্চিত করতে চাননি সনাতন— পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন আমিন ডেকে, দুই মেয়ে, তাদের অংশ মাণিককে দিয়েছে দুই দাদা যে যার জমির অংশ প্লটে -প্লটে ভাগ করে বেচে দিয়েছে। মাণিকের সীমানা সংলগ্ন দক্ষিণের এই পাঁচ কাঠার মালিক নানান গাছ লাগিয়েছে— মেহগনি, লম্পু, সোনাঝুরি, শিশুও আছে দু'একটা, তাদের ডালপালা সীমানা ছাড়িয়ে মানিকের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাকত মানিক। তার মনে হত ছায়া ক্রমে গাঢ় হচ্ছে অছচ তার মাথার ওপর আকাশটা কী ঘন নীল। মাথার মধ্যে কী-সব হিসেবের কাটাকুটি, হিসেব না মেলার ভঙ্গি ফুটে উঠত মাথা নাড়ানোর মধ্যে, বিড়বিড় করত, রোদ্দুর না -হলে বেঁচে থাকা মুশকিল।

একদিন এ কথাটা কৃষ্ণাকে জানাল সে। কুটিয়ালি ছেড়ে দিলে তাদের বছরের আয় প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। ছেলে - মেয়ে দুটো বড়ো হচ্ছে। তাদের জন্য খরচও বাড়বে।

তখন তারা একটা উপায় ভাবল। ফুলসরী বিলের ধারে এক দাগে যে চারবিঘে জমি আছে, তার উপরের দিকটা ডাঙ্গা জমি, সেখানে বাড়ি করা যায়—

—কিন্তু এ বাড়ি?

মাণিক বলল, আপাতত থাকবে। দরদাম পেলে বিক্রি করে দেব।

—সেই ভালো। এখানে আমরা কেমন একঘরে হয়ে গেচি, না?—চারপাশে সব বাবুদের বাস বাড়চে। কোথা থেকে কোথা থেকে সব লোকজন আসচে। কেউ চাষি না, কেউ কুমোর না— সব বাবু, আমাদের কথা কেউ বোঝেও না—সেদিন তুমি অমন মুখ করে বললে, মাস্টারবাবু। এবাড়ির-ওবাড়ির গাচেরা পরস্পর উঁকিঝুঁকি মারচে, মানুষগুলোন তো মুখ তুলে তাকাচ্ছে না, কী ব্যাপার বলেন তো!—তা একটা কথাও তো বলতে পারত!

—ঠিক বলেচ, বুঝতেই পারেনি, তা কী বলবে আর!

—বুঝতে পারেনি না, ভুল বুঝেছিল— দেখনি কদিন পর পাঁচিলের এদিকে আসা জবার ডালগুলো কেমন ছেঁটে দিল!

এভাবে শান্তিনীড়ের মায়া থেকে তারা মুক্ত হতে চেয়েছিল।

তারপর এক পয়সা বৈশাখের দিনে সবাই দেখল দুটো ভ্যানরিকসা, যার একটা মানিকের নিজের, নিজেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঘর - গেরস্থালির জিনিসপত্তর ভর্তি ভ্যান। কেবল কদিন পর, শান্তিকাকা, বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া, মুখে চোখে অজস্র বলিরেখা, এখনও মোড়ের মাথায় চা-দোকানে সকাল - বিকেল চা খেতে যান।, সেই চা দোকানেই মাণিককে বলেছিলেন, দ্যাশের মাটিতেই উদ্‌বাস্তু হইলা! এই রাচতা দিয়া ওপার থিকা কত মানুষ ঘরসংসার ভত্তি গাড়ি চালাইয়া গেচে গা! তখন মাণিকেরও চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল সেই সব গরুর গাড়ি— কী ক্লান্ত একঘেয়ে চাকার শব্দ জেগে উঠছিল তার স্মৃতিতে...কোলে কাঁধে বোঁচকা বুচকি, শিশু—মানুষের সারি, সঙ্গে দু'একটা কুকুর...কী আশ্চর্য! মানিকের বাড়িতে থাকা কুকুরটাও তাদের পাছ নিয়েছিল।

প্রথম দিকে এদিকটায় আসতে খুব ইচ্ছে হত কিন্তু খুব একটা আসা হয়ে উঠত না। আম কাঠালের সময়, ডাব-নারকেল পাড়তে, গাছ-গাছালি পরিষ্কার করতে মাঝে মধ্যে অবশ্য অসতে হত, এখন আসে কিন্তু এখন এক-একদিন অকারণে মাণিক বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায়। এই এখন যেমন সে দাঁড়িয়ে—

বাড়িটার রঙ ছিল সাদা। সেই সাদার ওপর এখন মার শ্যাওলার আস্তরণ। কার্ণিশে দু'একটা বট - অশ্বত্থ-ডুমুর—শেকড় ছড়িয়েছে। বলা ভালো ছড়াতে দিয়েছে সে। বারান্দায় গ্রীল-গেট বেয়ে তেলাকুচো তিতপোল্লার লতারা লাতিয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে, কোথ্যা অবলম্বন না পেয়ে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। বাড়িটাকে ঘিরে যেসব গাছ-গাছালি ছিল তার যেন সব বন্য স্বভাব ফিরে পেয়েছে— কিছুদিন আগেও ওই কাঠাল গাছটা কেমন যেন বিষণ্ণ ছিল, নারকেল— সুপারির সারি— যেন বাঁচতে হয় তাই বেঁচে ছিল। তখন সন্ধ্যামালতীর বেঁচে থাকাটা অবশ্য দেখবার মতো ছিল—ঘাসের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে দিব্যি সব লাল, হলুদ, সাদা ফুল মেলে ধরতে এখনও তেমনই আছে। কাঠটগর গাছটা এখনও পড়শিদের পুজোর ফুল জুগিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িটা এখন চামচিকে - কুনোব্যাঙদের আস্তানা। ইঁদুরেরা নিশ্চয়ই নেই। জানলা-দরজা সব বন্ধ। গ্রীল - গেটে জং ধরেছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা-জানলার চৌকাঠে উই। সব মিলিয়ে হানাবাড়ির মতো রহস্যময়, বাড়িটি গল্প ছড়িয়েছে, অনেক রাতে দোতলার ঘরে কেউ - কেউ আলো জ্বলতে দেখেছে। কেউ আবার কান্নার শব্দ শুনেছে।

বাড়িটার সীমানার উত্তর - পূর্ব - পশ্চিম দিক অন্যবাড়ির পাঁচিলে ঘেরা পড়েছে। দক্ষিণ দিকের প্লটে এখনও বাড়ি হয়নি। গাছগুলো আরও দামাল - ঘন, এবাড়ির গাছেদের সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে আকাশ সীমায়।

উঠোনে এখন এক হাঁটু ঘাস আর লতাপাতর জঙ্গল। একটা শহুরে আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িটা বেমানান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব দ্রুত বদলে গেল চারিধার। এর সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারত না তারা। কৃষ্ণ গত চার বছরে একবারও আসেনি এদিকে। চার বছর ধরে সে নতুন বাড়িটাকে ক্রমে বাসযোগ্য করে তুলেছে। শুধু ঘর বাঁধলেই হয় না। সেই ঘরের নানান গয়না আছে। সুপারি গাছ, নারকেল গাছ, কলা গাছ—সেসব গয়না ঠিক ঠিক জায়গায় হওয়া চাই, কৃষ্ণার চাওয়া মতো সবই হয়েছে, লকলক করে বেড়ে উঠেছে সব। আম - কাঠালও লাগানো হয়েছে। সব ঠিক - ঠাক চলছে, প্রচুর রোদ; একরোদেই ধান শুকিয়ে যায়। এখানে বিজলি বাতি ছিল, ওখানে হ্যারিকেনের আলোয় ছেলে মেয়ে দুই লেখাপড়া করে। এখানে ঘরগুলো কেমন ছিল নিরবিলি, ওখানে আলাদা দুটো ঘর—এক ঘরে মা-মেয়ে, আর একটায় সে আর ছেলে—সেই নিরিবিলি নেই। এটাই কৃষ্ণার একমাত্র অভাব।

—এই যে মাণিক বাবু!

মাণিক একটু চমকে উঠল। আকাশ মুখার্জী

—ভাগ্যিস আজ আমি অফিসে যাইনি— তাই দেখা হয়ে গেল।

—কেমন আচেনা?

—খুব অশান্তিতে আছি।

—কেন? কী হয়েচে?

—আর বলবেন না— আট নটার পর, পুবের জানলা বন্ধ রাখতে হয়— জুয়াড়িদের খিস্তি-খেউড়, মাতালের প্রলাপ—আপনার এখানে রীতিমতো আসর বসে—

—হ্যাঁ আমি শুনেচি। মাস্টারমশাই একদিন বলেচেন কিন্তু কী করি বলুন তো— ওরা যদি আমার কোনো ক্ষতি করত তাহলে হয়তো বলতে পারতাম— তাছাড়া অনেকেই পরিচিত, আত্মীয় স্বজন—

—কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে, একসঙ্গে ভাবলে নিশ্চয়ই পথ বেরুবে, আমরা একদিন আপনার বাড়িতে যাব।

—আচ্ছা, আসুন!

বাড়ি ফিরে কৃষ্ণাকে জানাল ব্যাপারটা। বলল, আমি তো আসলে বললাম, কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে— মাথায় ঢুকছে না কিছু।

—কী আর বলবে, সবাই মিলে যুক্তি করবে কীভাবে মদজুয়োর আসর বন্ধ করা যায়— হাজার হোক, বাড়িটা তো আমাদের—একটা মত তো নিতে হবে—তাই।

—দেখ, আমার সাফ কথা—ওরা খেলচে খেলুক, মত খাচ্ছে খাক। আমার কিছু বলার নেই।

কথার পিঠে কোনো কথা না বলে কৃষ্ণা একেবারে অন্য কতা বলল, আচ্ছা, তুমি কখনও বাড়িটার স্বপ্ন দেখেচে?

মাণিক মাথা নাড়ল।

—জানো আমি দেখি— বিয়ের পর বাপের বাড়ির স্বপ্ন দেখতাম খুব— ঘর গোচাচ্ছি, ঘর লেপচি—লুকোচুরি খেলচি, তেমাকে বলিনি, আজ বলচি, এখানে নয়, আমি যেন ও বাড়িতেই ঘুমোই—এক একদিন তোমাকে মনে করে আমি বুলটিকে জড়িয়ে ধরি স্বপ্নের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে সেই আগের মতো—

রোদে পোড়া শ্যামলা মুখশ্রীতে একটু যেন লজ্জার রঙ ছনাল, কী সব আবোল তালোব!

কয়েকদিন পর, চার-পাঁচজন মাণিকের বিলপারের বাড়িতে এল। তাদের দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে থাকল। তাকে থামানো যাচ্ছিল না। এই প্রথম এত বাবু একসঙ্গে তাদের বাড়িতে, এই বাড়িতে তো বটেই, ও বাড়িতেও কখনও আসেনি। নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হল মাণিকের। তার দাপট দেখাল কুকুরটার ওপর—একটা লাঠি তুলতেই সে কুঁই কুঁই করে তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। তারপর কথা শুর হল। একজন বলল, আমরা একাট সমল্যায় পড়ে এসেছি।

মাণিকের বলতে ইচ্ছে হল, জানি তো। কিন্তু তার মুখে চোখে অবাক হওয়ার ভান ফুটে উঠল।

মাণিকের বলতে ইচ্ছে হল, জানি তো। কিন্তু তার মুখে চোখে অবাক হওয়ার ভান ফুটে উঠল।

অন্য একজন বলল, অন্যভাবে বলা যায়— আপনার বাড়িটাই আমাদের সমস্যা।

মাণিকের ভ্রূ কুঁকানো দেখে আকাশবাবু বলল, বাড়িটা পেড়োবাড়ি সব গুণ একটু একটু করে আয়ত্ত করেছে।

মাষ্টারবাবু বলল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার সব।

পঞ্চায়েৎ অফিসের বাবু বলল, অ্যান্টি স্যোশ্যালদের ডেন হয়ে উঠছে।

—আমরা বুঝতে পারছি না, বাড়িটাকে ওভাবে নষ্ট হতে দিচ্ছেন কেন।

—বাড়িটাকে অন্তত ভাড়া দিন!

মাণিক বলল, না।

—তাহলে এমন কিছু করুণ—

আকাশবাবু বলল, আমি বলেছি।

মাণিক বলল, দেখুন মদ-জুয়া নিয়ে ওরা আছে থাক; থাকলেই বরং আপনাদের লাভ!

মাষ্টারবাবু বলল, বাড়িটা নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

—কোনো পরিকল্পনা নেই। আছে, থাক। চাষির ছেলে চাষিই থেকে গেলাম— আমার ছেলে যগি কখনও ...তখন চায়ের ট্রে হাতে কৃষ্ণা ঢুকে পড়েছে। কথা শেষ হল না ট্রেটা নামিয়ে রেখে কৃষ্ণা বলল, ওটা আমাদের বাগানবাড়ি হিসেবেই থাকবে। নিন!

একবার চোখ তুলে সবার দিকে তাকাতে দেখে কৃষ্ণাকে কেমন রহস্যময়ী মনে হল মাণিকের...